

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞান

সকল সংস্কৃতির মানুষই তাদের নিজস্ব পরিবেশ সম্পর্কে স্থানীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। সংস্কৃতিলাব্ধ এ জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ স্থানীয় প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। মানুষের জীবনধারণের অভিজ্ঞতা থেকে লোকজ বা স্থানীয় জ্ঞানের উৎপত্তি। জীবন ও প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা এসব সর্বজনীন চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নির্যাসই হলো লোকজ জ্ঞান। আবহমানকালের লোকজ জ্ঞানের ভান্ডার যথাযথ সংরক্ষণ ও চর্চার অভাবে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। অমূল্য এ জ্ঞানভান্ডার একটি জাতীয় সম্পদ। অন্যদিকে আধুনিক প্রযুক্তিও আজ পর্যন্ত মানুষের জন্য চূড়ান্ত ভরসার জায়গা হয়ে উঠতে পারেনি। তাই প্রযুক্তির উন্নয়নের পাশাপাশি লোকজ জ্ঞানের অমূল্য ভাণ্ডারকেও দেশের স্বার্থে রক্ষা করা প্রয়োজন। প্রতিদিনের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে লোকজ জ্ঞানের ব্যবহার ও চর্চা অব্যাহত আছে। এই অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞানের নানা বিষয় সম্পর্কে জানব।



চিত্র- ৫.১: নিজেদের বানানো তাঁতে কাপড় বুনছে

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রবাদ-প্রবচনের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব ;
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারব ;
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞান ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজজীবনে লোকজ জ্ঞানের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং লোকজ জ্ঞানের প্রতি মর্যাদা দানের মনোভাব পোষণ করব।

পাঠ - ০১: লোকজ জ্ঞান

কোনো অঞ্চলে শত শত বছর বসবাস করে স্থানীয় পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব জীবনধারা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলে। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের উৎস, আহরণের উপায় ও প্রস্তুত করার কৌশল উদ্ভাবন করেছে। এভাবেই তারা তাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে আবাসস্থল নির্মাণ করে কিংবা তার চারপাশের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে জীবন ধারণ করে। এসব বিষয়ে সকল সংস্কৃতির মানুষেরই রয়েছে নিজস্ব স্থানীয় জ্ঞান। কৃষিকাজ, স্বাস্থ্যরক্ষা, খাদ্যাভ্যাস, শিক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বহুবিধ কাজে এ ধরনের লোকজ বা আঞ্চলিক জ্ঞান ব্যবহৃত হচ্ছে। এভাবে সকল সংস্কৃতির মানুষই তাদের নিজস্ব পরিবেশ সম্পর্কে স্থানীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। সংস্কৃতিলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ স্থানীয় প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। নিজস্ব বসবাস অঞ্চলের পরিবেশ সম্পর্কে কোনো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিলব্ধ জ্ঞান হলো লোকজ জ্ঞান।

মানুষের জীবনধারণের অভিজ্ঞতা থেকে লোকজ বা স্থানীয় জ্ঞানের উৎপত্তি। এই জ্ঞানের উৎস কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা গবেষণা প্রতিষ্ঠান নয়। বরং সাধারণ মানুষের আলোচনার মাধ্যমে বা মুখে মুখে লোকজ জ্ঞান বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়। এসকল লোকজ জ্ঞান সাধারণত কোনো বই বা গ্রন্থে সবসময় মুদ্রিত থাকে না। লোকজ বা স্থানীয় জ্ঞান তাই নির্দিষ্ট অঞ্চল ও সংস্কৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকে। লোকজ জ্ঞান হলো নির্দিষ্ট সমাজ-সংস্কৃতিতে গড়ে উঠা স্থানীয় পর্যায়ের জ্ঞান যা ঐ সমাজ-সংস্কৃতির অনন্য ঐতিহ্য। আমাদের দেশে কৃষকের বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক চাষাবাদ সম্পর্কিত পৃথক পৃথক জ্ঞানকে লোকজ বা স্থানীয় জ্ঞান বলা যেতে পারে। কৃষক জানেন যে কীভাবে বীজ সংরক্ষণ করতে হয়, কীভাবে বীজতলা করলে ভালো চারা উৎপন্ন হয়, কোন জমিতে কোন ধরনের ফসল ভালো হয়, কখন সার দিতে হয় ইত্যাদি। একইভাবে আকাশে মেঘের অবস্থান ও রং দেখে গ্রামের সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কতটা। এগুলো সবই লোকজ বা স্থানীয় জ্ঞানের উদাহরণ। লোকজ জ্ঞানের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যথা:

- এটি অঞ্চল ও সংস্কৃতিভেদে নির্দিষ্ট।
- জীবনধারণ ও প্রতিনিয়ত টিকে থাকার জন্য এই জ্ঞান অপরিহার্য।
- এই জ্ঞান বই-পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা লিপিবদ্ধ নয়।
- এই জ্ঞানের প্রসার ও প্রবাহ হয় সাধারণত মৌখিক, কথ্য রীতি বা আলোচনার মধ্য দিয়ে।
- মানুষের অভিজ্ঞতা, খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করেই এই জ্ঞান সৃষ্টি হয়।

লোকজ জ্ঞান এবং আধুনিক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

লোকজ জ্ঞান	আধুনিক জ্ঞান
লোকজ জ্ঞান সাধারণত মানুষের মুখে মুখে বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়।	আধুনিক জ্ঞান হলো লিখিত। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে আধুনিক জ্ঞান শেখানো হয়।
দৈনন্দিন কাজকর্ম আর কাজের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে লোকজ জ্ঞান অর্জিত হয়।	আধুনিক জ্ঞান বিশ্লেষণমূলক। যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে আধুনিক জ্ঞান আহরণ করা হয়।
সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কিত এই জ্ঞান অনুসারে প্রকৃতির সকল উপাদান আন্তঃসম্পর্কীয়। তাই লোকজ জ্ঞান সামগ্রিক এবং আলাদা বা শাখা-উপশাখায় বিভক্ত নয়।	আধুনিক জ্ঞান বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বা ধারা-উপধারায় বিভক্ত। যেমন: বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা।

বর্তমানে আধুনিক জ্ঞান প্রসারের কারণে এই লোকজ জ্ঞান নানা ভাবে অবহেলিত হয়েছে। আমরা খুব সহজে ভুলে যাই যে এই লোকজ জ্ঞান ও কৌশল দ্বারাই শত শত বছর ধরে মানুষ তার প্রকৃতি, সমাজ ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে বসবাস করে আসছে। যেহেতু লোকজ জ্ঞান মানুষের বেঁচে থাকার সাথে সম্পর্কিত, স্থানীয় পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ এই জ্ঞানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও জীবনধারণ করে। উল্লেখযোগ্য কিছু ক্ষেত্র হলো: (১) কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, (২) স্বাস্থ্য, (৩) শিক্ষা, (৪) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও (৫) সমাজ ভিত্তিক অন্যান্য কার্যক্রম।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	লোকজ জ্ঞান বলতে কী বোঝায়? লোকজ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করো।
কাজ- ২:	লোকজ জ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞানের পার্থক্য লেখ।

পাঠ- ০২ ও ০৩: প্রবাদ-প্রবচনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞান

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব কিছু প্রবাদ প্রবচন আছে। লোকজ জ্ঞানের আধার এসব প্রবাদ-প্রবচন তারা দীর্ঘকাল ধরে বংশপরম্পরায় ব্যবহার করে আসছে। এগুলো মূলত মৌখিক সাহিত্য এবং লোক সাহিত্যের প্রধান শাখা। একটি জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারা ও লোকজ্ঞানের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রবাদ-প্রবচনে। প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তাদের অভিজ্ঞতাকে মুখে মুখে ছড়িয়ে দেয়। যা থেকে অন্যরা শিক্ষা লাভ করতে পারে। এমনকি শিক্ষিত মানুষেরও এ থেকে অনেক কিছু শেখার ও জানার আছে। এসব প্রবাদ-প্রবচন ঠিক কবে, কখন, কোথায় সৃষ্টি হয়েছিল তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবে প্রবাদ-প্রবচনের অন্যতম গুণ হচ্ছে এর সর্বজনীনতা। এর মধ্যে যেমন সাধারণ বুদ্ধির পরিচয় রয়েছে, তেমনি কৌতুক বা হাস্যরসেরও উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রবাদ প্রবচনের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য

রয়েছে। যেমন-

- ক. হাজার বছরের অভিজ্ঞতা, পরিণত লোকজ্ঞান এবং প্রজ্ঞা।
- খ. মূল্যবোধ এবং নীতিবাক্য প্রকাশিত হয়।
- গ. সকলের কাছে গ্রহণীয় ও সকলের মাঝে প্রচলিত।
- ঘ. সংক্ষিপ্ত পরিসরে সহজ বাক্যে বা ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশিত।
- ঙ. নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্য বহন করে।
- চ. অলংকারিক ভাষায় প্রকাশিত হয় (উপমা, বিরোধভাস প্রভৃতি)।

অন্যান্য জাতির মতোই বাংলাদেশের বিভিন্ন সুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাঝেও প্রচলিত রয়েছে নিজস্ব কিছু ছড়া ও প্রবাদ-প্রবচন। তবে এর অনেক কিছুই লিখিত না থাকায় সেগুলো আজ আর তেমন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলাদেশের কয়েকটি সুদ্র নৃগোষ্ঠীর কিছু প্রবাদ-প্রবচন এবং তার বাংলা মর্মার্থ উল্লেখ করা হলো:

সুদ্র নৃগোষ্ঠী	প্রবাদ-প্রবচন	বাংলা তর্জমা	ভাবার্থ / বাংলা প্রবাদ
চাক	দুঃখা আহান্নে ছুকখালুদে।	কষ্ট করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।	বাংলা ভাষাতেও অনুরূপ একটি প্রবচন চালু আছে। সেটি হলো - 'কষ্ট করলে ফল মেলে'।
পাংখোয়া	ল এক ছাউ।	দলের মধ্যে একজন খারাপ হলে সকলেরই দুর্নাম হয়।	
ম্রো	ভাসাই ওয়াককই পের টাই টায়া ফুল দৈ।	মরা হাতির দেহ কুলা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না।	সত্য কখনো গোপন থাকে না।
মৈতৈ	অবিক পসি মরল মুন্না চায়।	কৃপণ লোকের ধন সম্পদ ঘুন পোকায় যায়।	সম্পদের সচিবহার না করে সেগুলোকে অযথা আঁকড়ে ধরে থাকা ঠিক নয়। কারণ এতে সম্পদ নষ্ট হয়ে যায় এবং অবশেষে কোনো কাজে আসে না।
বিষ্ণুপ্রিয়া	অকনেইর জতা ছিড়ইন।		অদক্ষ লোক হারা কাজ করলে অযথা পরিশ্রম আর বিশৃঙ্খলা হয়।
হাজং	দিনুনি আশা, রাতিনি গাসা।	দিন হচ্ছে কাজের জন্য আর রাত হচ্ছে বিশ্রামের।	ভালো কাজ করার জন্য উদ্যমের প্রয়োজন, আর তা দিনেই করা উচিত।
খাসি	উ বাম হাতি কিত কুলাই।	হাতির মতো খাও আর ঘোড়ার মতো দৌড়াও (কাজ কর)।	পেটে না দিলে পিঠে সয় না

মান্দি	সংজ্ঞা প্রাপ, পাংসা, নিগামো মাংসা মাংসা, মাদে রাসং গ্লাংজ।	বৃক্ষের সেরা বুড়ো বট, জীবের বৃহৎ ঐরাবত।	ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষই আসল মানুষ।
খুসী	সিখি ডিই লেখা সেউজা বাই।	হরিণ শিকারের আগে কলাপাতা মাটিতে বিছানো।	মরার আগে ভূত হওয়া।
মারমা	খকহু মতইকে অমুই মুখ।	হোঁচট না খেলে কেউ মাকে ডাকে না।	বিপদে পড়লে তবে মানুষ আপন জনকে খোঁজে।
ত্রিপুরা	'লাইয় বুসু কালাই খাই লাইসে পাগ', 'বুসুগ' লাই কালাই খাই হেই লাইসে পাগ'।	কাটা পাতার উপর কাঁটা পড়লে পাতা ছিঁড়ে যায়, আবার কাঁটার উপর পাতা পড়লেও পাতা ছিঁড়ে যায়।	সবল দুর্বলের উপর পড়লে যা হয় দুর্বল সবলের উপর পড়লেও তাই। মরার উপর ঝাঁড়ার ঘা
ওরাও	ঘারসে নিকেলকে কোনহু কামনে যারেক সময় খালি খাইল্যা দেখলে বরাত খারাপ।	ঘর থেকে বের হয়ে কোনো কাজে যাওয়ার সময় খালি কলস দেখলে যাত্রা অশুভ।	
সাঁওতাল	পুখি খনু তুখিগে সরসা, ধরমু খনু করমুগে লাট গেয়া।	পড়ার চেয়ে শোনা ভালো, ধর্ম অপেক্ষা কর্ম ভালো।	
চাকমা	ভাত মিজাল্যা খা-দে সুখ, মানুচ মিজাল্যা চা-দে সুখ।	মিশ্র চালের ভাত খেতে মজা, আর মিশ্র বর্ণের (নানা জাতি-বর্ণের) মানুষকে দেখতে পাওয়া সুখকর।	বৈচিত্র্য না থাকলে যে কোনো জিনিস একঘেয়ে ও বিরক্তিকর মনে হয়।

অনুশীলন

কাজ- ১:	প্রবাদ-প্রবচন কি লোকজ জ্ঞান? প্রবাদ-প্রবচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করো।
কাজ- ২:	যে কোনো তিনটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রবাদ-প্রবচনের ভাবার্থ বিশ্লেষণ করো।

পাঠ- ০৪ ও ০৫: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ চিকিৎসা জ্ঞান

আদিকাল থেকেই মানুষ স্বাস্থ্য সমস্যা ও রোগব্যাধিকে জয় করার চেষ্টা করছে। যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ে রোগের ধরন ও প্রকোপ যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তেমনি সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নত ও আধুনিক হয়ে উঠেছে চিকিৎসা পদ্ধতিও। তবে আধুনিক যুগে নানা ঔষধ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের আগে মানুষকে রোগের চিকিৎসার জন্য লোকজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হতো। তারা বনের লতাগুল্ল, গাছ-গাছালির ছাল, পাতা ও ফলমূল, শেকড়-বাকড়, খনিজ দ্রব্যাদি, কীট-পতঙ্গ এবং নিজেদের ঘরে তৈরি পানীয় বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করত। কোনো গাছের বা দ্রব্যের কী ঔষধি গুণ আছে এবং কোন অসুখে তা ব্যবহার করতে হবে সেটি তারা ভালোভাবে জানত। কারণ প্রাকৃতিক বা ভেষজ ঔষধের ব্যবহার সম্পর্কে তাদের রয়েছে হাজার বছরের অভিজ্ঞতা এবং লোকজ চিকিৎসা জ্ঞান।

আধুনিক যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। চিকিৎসা পদ্ধতি সহজ ও উন্নত হয়েছে। আবার দেখা গেছে মানব দেহের উপর আধুনিক কিছু ঔষধের ক্ষতিকর প্রভাবও রয়েছে। শুধু তাই নয়, আধুনিক চিকিৎসা সেবা অনেকাংশে ব্যয়বহুল। আবার আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে কিংবা প্রত্যন্ত এলাকায় আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির সুযোগ এখনও সীমিত। তাই এসব অঞ্চলের মানুষকে তাদের স্থানীয় ও লোকজ চিকিৎসা সেবার উপর অধিক নির্ভর করতে হয়। লোকজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত উপকরণগুলো সহজলভ্য অর্থাৎ স্থানীয় পরিবেশ থেকে সহজেই সংগ্রহ করা যায়। লোকজ চিকিৎসা পদ্ধতির ভিত্তি হলো বিভিন্ন ঔষধি গাছ ও প্রাকৃতিক উপাদানের চিকিৎসা গুণ সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর রয়েছে এ বিষয়ে হাজার বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। লোকজ চিকিৎসা পদ্ধতির জনপ্রিয়তার কিছু মৌলিক কারণ রয়েছে, যেমন (১) দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কারণে এর সফলতা সম্পর্কে মানুষের আস্থা, (২) লোকজ চিকিৎসা সেবা ও জ্ঞান হলো স্থানীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, (৩) স্থানীয়ভাবে সহজেই ও স্বল্পমূল্যে লোকজ চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায়, (৪) আধুনিক চিকিৎসা সেবা স্থানীয়ভাবে কিংবা সবার জন্য সহজলভ্য নয়।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে নিজেদের তৈরি ঔষধ দিয়ে সফলতার সাথে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হয় যথা জ্বর, সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, জন্ডিস, সরীসৃপ ও অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণীর দংশন, গুটিবসন্ত, জলবসন্ত, বাত, বদহজম, ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, পাইলস, নানা চর্মরোগ, খুসকি, স্ত্রীরোগ, বন্ধ্যাত্ব, ডায়াবেটিস, দন্তরোগ, কাঁটাছেঁড়া, মচকানো বা ভাঙা হাড়ের চিকিৎসা প্রভৃতি। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত চিকিৎসা সেবার একটি হলো লোকজ জ্ঞাননির্ভর ধাত্রীবিদ্যা। শিশুর জন্মের সময় নিবিড় তদারকি এবং নবজাতক ও প্রসূতি মাকে সেবা দানের জন্য তাদের সমাজে বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তি রয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের কোনো সুযোগ হয়তো তাদের অনেকের জীবনে ঘটেনি। সেক্ষেত্রে প্রকৃতিই তাদের আদর্শ শিক্ষক। তারা সাধারণত হয়ে থাকেন বয়স্ক নারী এবং তাদের একটি নির্দিষ্ট পদবিও থাকে। যেমন - চাকমা সমাজে ধাত্রীবিদ্যার কাজ যারা করেন তারা 'ওবা' নামে পরিচিত। মণিপুরী সমাজে তাদেরকে ডাকা হয় 'মাইবি' নামে। এছাড়াও রয়েছেন বিভিন্ন রোগব্যধির প্রতিকার সম্পর্কে প্রাচীন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ স্থানীয় কবিরাজগণ। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ও গবেষণার মাধ্যমে লোকজ চিকিৎসা ব্যবস্থায় উন্নয়ন ঘটানো গেলে দেশের জন্য তা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

নিচে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত কয়েকটি চিকিৎসা প্রণালি উল্লেখ করা হলো

রোগের নাম	ঔষধ তৈরির বনজ উপকরণ	প্রস্তুত প্রণালি ও ব্যবহার
জন্টিস	(১) মোরমোচ্যা আমিল্যা (লতা জাতীয় এক ধরনের টক পাতা যা পার্বত্য এলাকার জঙ্গলে পাওয়া যায়)। (২) মোগোই কাঙড়া (আকারে খুব ছোট এক ধরনের কাঁকড়া যা পার্বত্য চট্টগ্রামের নদী ও ঝরণার জলে পাওয়া যায়। কাঁকড়াটি দেখতে ধূসর বর্ণের)।	প্রথমে দুইটি উপকরণ ভালোভাবে ধুয়ে বেছে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর পরিমাণ মতো লবণ ও পানি মিশিয়ে সেগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ করতে হবে। এসময় কাঠি দিয়ে নেড়ে ফুটন্ত উপকরণগুলো একসাথে গুলিয়ে নিয়ে স্যুপ তৈরি করতে হবে। স্যুপটা কুসুম গরম অবস্থায় দিনে কয়েকবার খেতে হবে।
বাচ্চাদের সর্দি-কাশি	খোঁরা গাছের মূল ও পাতা, কুরা চিত শাক এবং লোহার জারণ।	উপকরণগুলো একসঙ্গে বেটে রস আগুনে পোড়ানো লাল লোহার সেকা দিয়ে গরম করে নিতে হবে। এরপর প্রতি বার ১/২ ছটাক পরিমাণ সেবন করতে হবে।

অনুশীলন

কাজ- ১:	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ চিকিৎসা জ্ঞান কেন গুরুত্বপূর্ণ? নিজের মতামত দাও।
কাজ- ২:	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে ভেষজ ঔষধ তৈরির জন্য সাধারণত কী কী উপকরণ ব্যবহৃত হয়?

পাঠ- ০৬: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ কৃষি জ্ঞান

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষিকাজ, জুমচাষ ও উদ্যানচাষের উপর নির্ভরশীল। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ পাহাড়ে জুমচাষ ও সমতলে চাষাবাদ-দুটোতেই অভ্যস্ত। তবে যারা পাহাড়চূড়ায় বসবাস পছন্দ করে, জুমচাষ তাদের প্রধান জীবিকা। আর যারা পাহাড়ের পাদদেশ কিংবা সমতল অঞ্চলে বাস করে তাদের কাছে জুমচাষ ও হালকৃষি দুটোই সমান পরিচিত। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের পাংখোয়া, শ্রো, বম, লুসাই প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর লোকালয়গুলো মূলত উঁচু পাহাড়শ্রেণির ঢালে বা চূড়ায় হয়ে থাকে বলে তারা জুম চাষে অভ্যস্ত। আর অন্য দিকে যারা অপেক্ষাকৃত নিচু পাহাড়, সমতল কিংবা নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বাস করে যেমন রাখাইন, চাকমা, মারমা, মান্দি, হাজং প্রভৃতি জনগোষ্ঠী জুমচাষ ও হাল কৃষি -দুটিতেই অভ্যস্ত। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর জীবিকা নির্বাহের সেই ধারা আজও অব্যাহত আছে। সুতরাং যেসব অঞ্চলে তারা এখন বসবাস করছে সেখানকার ভূপ্রাকৃতিক অবস্থা অনুযায়ী তাদের চাষাবাদের ধরন নির্ধারিত হয়।

চাষাবাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ যুগ যুগ ধরে তাদের লোকজ জ্ঞান প্রয়োগ করে আসছে। কীটনাশকমুক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনে তাদের এই লোকজ জ্ঞানের রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। যেমন- পাহাড়ে যে জুমচাষ হয় তাতে শিল্পকারখানায় উৎপাদিত কোনো প্রকার সার বা কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না। সাধারণত নিজেদের তৈরি জৈবসার ও পোকামাকড় দমনের নিজস্ব পদ্ধতি তারা প্রয়োগ করে থাকে। সমতল অঞ্চলে হালচাষের ক্ষেত্রেও তারা কৃত্রিম সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করার রীতি মেনে চলে। জুমচাষে যে ধান বা শস্যবীজ ব্যবহার করা হয় সেগুলো একেবারেই অকৃত্রিম দেশজ উপকরণ যা শত শত বছর ধরে এবং বংশ পরম্পরায় এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো ব্যবহার ও সংরক্ষণ করে আসছে।

চাষাবাদের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর রয়েছে হাজার বছরের লোকজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রভাব। একই জুমখেতে একযোগে বিভিন্ন ফসলের ফলন কীভাবে পাওয়া যায়, পোকামাকড় থেকে রক্ষা করে কীভাবে সেই ফসল পর্যায়ক্রমে সারা বছর কাজে লাগানো যায় তা তারা জানে। ফসলের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য যাতে রক্ষা পায় তার জন্য তারা কিছু নিয়ম ও সংস্কারও মেনে চলে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু কিছু এলাকা বা বনভূমি আছে যেখানে তারা জুমচাষ করে না। তাদের ধারণা এসব স্থানে জুমচাষ অমঙ্গল বয়ে আনবে। সাপের গর্ত, বাদুরের পুরনো আস্তানা বা পাহাড়গুলোর বিশেষ আড়াআড়ি অবস্থান প্রভৃতি দেখে সমাজের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝতে পারেন কোন কোন এলাকায় জুমচাষ এড়িয়ে চলতে হবে। এছাড়া জুমচাষিরা বড় এবং বিশেষ ধরনের উপকারী গাছ গাছালি, বাঁশের মূল এবং বিশেষ কিছু পশু-পাখি ও কীট পতঙ্গকে সযত্নে রক্ষা করে চলে। কোনো স্থানে একবার জুমচাষ করার পর তা তারা চার পাঁচ বছর ধরে অনাবাদি ফেলে রাখে জমির উর্বরতা শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য। এসবই তাদের হাজার বছরের লোকজ জ্ঞানের আবিষ্কার যা তারা পরিবার ও প্রকৃতি থেকে শিখেছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এখন ব্যাপক আলোচনা চলছে। সমস্যা হলো, এসব উন্নয়ন আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের হাজার বছরের লোকজ জ্ঞানকে উপেক্ষা করা হয়। ফলে উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায় না। জুমচাষের ভালোমন্দ বিষয়েও একই কথা প্রযোজ্য। দেশের পাহাড় ও বনাঞ্চলে নানা কারণে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়া, নিয়ন্ত্রণ ও নিষেধাজ্ঞার ফলে এখন জুমচাষের পরিমাণ অনেক কমে এসেছে। সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা এবং বনাঞ্চল দখলের প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় জুমচাষের প্রচলিত নিয়মও সর্বদা মানা হচ্ছে না। ফলে চাষিরা জুমচাষ থেকে আশানুরূপ সুফল পাচ্ছে না।

আমাদের দেশে সুন্দরবন ছাড়াও চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও মধুপুরে পাহাড় ও বনাঞ্চল রয়েছে। এই বনাঞ্চল ও পাহাড় আমাদের জাতীয় সম্পদ। এসব বন ও জীববৈচিত্র্য ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এবং বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞানকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। বন ও প্রকৃতির কোলে যাদের বসবাস তারা জানে কীভাবে নিজের আশ্রয়স্থলকে সযত্নে রক্ষা ও পরিচর্যা করতে হয়। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণতা, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i ও ii

গ. i ও iii

ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুপম চাকমা একই জমিতে একসাথে ধান, কুমড়া এবং পেঁপের চাষ করেন। তিনি জমিতে লতা-পাতা পঁচিয়ে তা সার হিসাবে প্রয়োগ করেন। পর্যায়ক্রমে ফসল উত্তোলনের পর তিনি অন্য অনাবাদি জমিতে চাষাবাদে মনোনিবেশ করেন।

ক. মাইবী কী?

খ. লোকজ জ্ঞানের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

গ. অনুপম চাকমার চাষ পদ্ধতির ধরন ব্যাখ্যা করো।

ঘ. অনুপম চাকমার চাষপদ্ধতি কি পরিবেশ বান্ধব? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।